ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 819-826
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.073

শিক্ষা সংস্কৃতি চর্চায় ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরীকারা

দেবরূপা সেন, *সহকারী আধ্যাপক, বিবোধানন্দ সরস্বতী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, বারাসাত, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.01.2025; Accepted: 24.01.2025; Available online: 31.01.2025
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the 19th century, when the dawn of the Renaissance was gradually becoming brighter in the inner palace of the JorasankoThakurbari, not only men but also women participated in the new changes in society and culture. They simultaneously managed the inner palace by following traditional customs and developed their talents and practiced art, culture and literature. Not only that, they also participated equally in various social and political issues. And later, when they sat down to write their memoirs about this family history and the scope of cultural practice, the writing captured a fascinating analysis of the times. There, they painted a unique picture of not only themselves but also the women's awakening of the entire society.

Keywords: Thakurbari, Renaissance, Equal Rights, Women's Education, Women's Liberation, Paradise, Holidays, Women's Awards.

বিশ্ব আজ একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরও এগিয়ে চলতে শিখিয়েছে। কিন্তু চিত্রটা এমন ছিল না। শতাব্দীর পাতা উল্টিয়ে যদি পেছনের দিকে চোখ রাখা যায় তবে দেখা যাবে অতীতে নারী ছিল অবহেলিতা শোষিতা। অতীত সমাজ নারীকে দিয়েছিল সতীদাহ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ নানান সামাজিক বাধা-নিষেধের বেড়াজাল। সময়ের সাথে সাথে সমাজের বিকাশ ঘটেছে তাই আজ নারীরা সেই শৃঙ্খলের বন্ধন চূর্ণ করে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। পুরোপুরি না হলেও অনেকটা বুঝে নিতে শিখেছে নিজেদের অধিকার। সমাজের সাথে পাল্লা দিয়ে তারা নিজেকে অবহেলা করা ছেড়ে দিয়েছে। তাই নিজেকে বিকশিত করার ক্ষেত্রেও তাদের প্রচেষ্টার অন্ত ছিলনা।

পুরুষের 'ছায়ানুগতা' জীবন থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে নানান আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সমাজ জীবনে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠা ঘটেছে। নারীরা কেউই যদিও বা নারী মুক্তির আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেনি। তবুও আন্দোলন হয়েছিল আর তার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল নারী জীবনে। তবে পুরনো সংস্থান ছেড়ে নতুন সংস্কার গ্রহণ করা সেদিন নারীর পক্ষে খুব সহজ হয়নি। দ্বিধা দ্বন্দ্বের আঘাত খেতে খেতে

তার বিকাশ ঘটেছে। তবে একথাও ঠিক ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাদের প্রেরণা জুগিয়েছিল নবজাগরণ। ফলে পুরুষের ছায়ায়, পর্দার আড়ালে নিজেকে গুটিয়ে রাখা নারী সমাজকে এ শতাব্দী কাছে টেনে নিল। বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে নানান কুসংস্কারও অশিক্ষার অন্ধকারে আবদ্ধ থাকা নারীকে আলোর পথ দেখালেন রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগরের মতো মনিষীরা।

নারীদের সমাজ সংস্কারের বিধি-নিষেধের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করার জন্য তারা শিক্ষার আলোয় নারীকে আলোকিত করে তুলতে প্রয়াসী হলেন। নারী শিক্ষার সূচনা ঊনবিংশ শতাব্দীর অর্ধদশক পরে সূচনা পর্ব থেকে নারীগণ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গেই শিক্ষাকে গ্রহণ করেছেন। তাই অন্তঃপুর বাসিনীরা কলম তুলে নিজেদের কথা নিজেরাই বলতে পেরেছেন।

তবে এই অবস্থার পরিবর্তনও এত সহজে আসেনি। কারণ সমাজ সংস্করণের পাশাপাশি একদল রক্ষণশীল মানুষও সমাজে ছিল। যারা স্ত্রী শিক্ষার বিস্তারকে সহজে মেনে নিতে পারেনি। তখন বহু যুগে উন্মোচন করে নারীরা স্বরবে বলে –

> "পুরুষগণ কেন আমাদিগকে এরূপ নিকৃষ্টাবস্থায় রাখিয়েছেন? আমরা কি পরম পিতার সন্তান নই? পুরুষেরা নানারূপ বিদ্যাভাস করিয়া পরমজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ইহকালেই পরমাত্মার রসস্বাদনে অনুপম সুখানুভব করিতে পারেন। আমরা কি উক্ত সুখের কনা মাত্র প্রাপ্ত হইবো না? - আর কতদিন আমরা এই শৃঙ্খলরূপ গৃহরুদ্ধা থাকিব?"[১]

অর্থাৎ এই সময়পর্ব থেকেই মেয়েরাও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদিনী হল। পরিবার জীবনে তো বটেই সমাজ জীবনেও তারা পুরুষের পাশে এসে দাঁড়ালেন। অবশ্যই এর জন্য তাদের মহৎ স্বামীদের অবদানও কম ছিল না। এদিক থেকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন ঐতিহ্যশালী ঠাকুরপরিবার।

ঠাকুরবাড়ি ছিল তৎকালীন সময়ের থেকে ঢের এগিয়ে থাকা একটি পরিবার। পুরুষদের সাথে সমান পদক্ষেপ ফেলে এ বাড়ির মেয়ে বৌরাও বাড়ির সাহিত্য সংস্কৃতি অঙ্গনকে আলোকিত করে তুলেছিল। যার ফলে শুধু সাহিত্য সংস্কৃতি নয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছিল আধুনিকতার আলো। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি সমগ্র বাঙালি জাতিকে তথা নারীজাতিকে উজ্জীবিত-উদ্দীপিত করে তুলেছিল। গতানুগতিকতার বেড়াজাল ভেঙে তারা নিজেদের সাথে সমাজেকে উদার মুক্ত হতে দীক্ষা দিয়েছিল। পরিবার জীবনে শিক্ষার মাধ্যমে মুক্তি খুঁজে পেয়েছিলেন ঠাকুরবাড়ি অন্তঃচারিণীরা। সেই শিক্ষা গ্রহণের ফলেই তারা সাহিত্য- সংস্কৃতি- শিল্প সর্বক্ষেত্রে নিজেদের স্বতন্ত্রতা বজায় রাখতে পেরেছিলেন।

সেই স্বতন্ত্রতাকে কীভাবে তারা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন সে বিষয়েই আমরা এখন বিশদে আলোচনা করব–

ঊনবিংশ শতাব্দীর সোনালী সফল পর্বে ঠাকুরবাড়ি মেয়েরা আবছা পর্দার আড়ালে অস্পষ্ট হয়ে না থেকে নবযুগের ভিত গড়বার কাজে হাত লাগিয়ে ছিলেন। কখনও প্রত্যক্ষভাবে আবার কখনও পরোক্ষে। পুরুষের প্রতিভার প্রদীপে তেল সলতে যোগানোর দায়িত্ব নিয়ে। সমাজের চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করে ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা সে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে পুরুষের পাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাহস অর্জন করেছিল তা কিন্তু কম গৌরবের কথা নয়। স্মৃতি– বিস্মৃতির অন্তরালে লুকিয়ে থাকা হারিয়ে যাওয়া সেই মেয়েদের নিয়েই এই প্রসঙ্গের অবতারণা।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচার করে দেখা যায় হিন্দুসমাজের বাধা নিষেধ ও তার কড়াকড়ি, ঠাকুরবাড়ি মেয়েদের বিশেষ অসুবিধায় ফেলতে পারেনি। ঠাকুরবাড়ি তৎকালীন ব্রাহ্মণদের কাছে ছিল 'পিরালী'। খানিকটা একঘরের মতো স্বতন্ত্র। তারপরে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করার পর শাসনের গিট আপনি শিথিল হয়ে এসেছিল।

সাহিত্য সঙ্গীত বা শিল্পের দিক থেকে নতুন কিছু পাবার আগে প্রকৃতপক্ষে বাঙালি মেয়েরা ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের কাছে পেল আত্মবিশ্বাসের শক্তি আর এগিয়ে যাওয়ার একটি প্রশস্তপথ। তাই তাদের কাছে ময়দানে ঘোড়া ছোটানো, কালাপানি পেরিয়ে বিলেতে যাওয়া, লাটভবনে নিমন্ত্রণ রাখা, আমেরিকায় বক্তৃতা দেওয়া, স্কুলে পড়া, ছবি আঁকা, গান গাওয়া, অভিনয় করা, বই লেখা, আত্মজীবনী প্রকাশ, স্বদেশ সেবা সমিতি প্রতিষ্ঠা সবই অর্থবহ হয়ে উঠলো। সমাজের ধীর-স্থীর বুকে নানা আকারে আন্দোলন তুলে বাঙালি মেয়েদের লজ্জা ভীরু মনে সাহস জোগাবার জন্যও এর দরকার ছিল। এরজন্য ঠাকুরবাড়ি মেয়েদের ভূমিকা কখনও ভুলে যাওয়া উচিৎ নয়। এভাবে তারা নিজেদের সাথে সাথে নারী সমাজের আত্মবিকাশের পথকে প্রশস্ত করে। তাই এই কথা বলা যায়- "কিশোর রবীন্দ্রনাথের জন্য বাড়ির মধ্যে একটা সাহিত্যিক আবহাওয়া গড়ে তুলতে তাঁর দিদি বৌদিদের ভূমিকা কোন অংশে কম নয়। আবার পরিণত বয়সে নৃত্য-গীত-অভিনয় সংক্রান্ত নিজস্ব ভাবনাকে রূপায়িত করবার সময়েও তিনি বারবার ডাক দিয়েছেন বাড়ির মেয়েদের।"[২]

তবে এই দিনগুলি সমাজের সর্বত্র সমানভাবে আসেনি। কারণ একটিমাত্র বাড়ির মেয়েদের পক্ষে সার্বিক জাগরণ ঘটানো সম্ভব হয়ে উঠছিল না। ধীরে ধীরে সলতে পাকাবার আয়োজন চলছিল। তারপর ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা এনে দিলেন নবজাগরণের প্রদীপ শিখাটিকে। আর তা এনে দিলেন শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে। অবশ্য এর জন্য ঠাকুরবাড়ির কর্তা ব্যক্তিদের অবদানও অনস্বীকার্য। কারণ তাঁরা খুবই উদার মনস্ক ছিলেন। মেয়ে-বৌদের লেখাপড়া শেখায় তাঁরা কোনও বাধা তো দেনইনি, উপরন্তু উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। দ্বারকানাথের পিতার আমল থেকেই তাই এবাড়ির মেয়েরা লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করেছিলেন বৈষ্ণবীর কাছে। যার ফলস্বরূপ এবাড়ির পুরুষদের মত মেয়েরাও স্মরণীয় হয়ে রইলেন চিরকালের মতো।

দ্বারকানাথের পিতার আমল থেকে যে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন শুরু হয়েছিল তার ধারা বয়ে চলল প্রজন্মের পর প্রজন্মের হাত ধরে। দ্বারকানাথের স্ত্রী ছিলেন দিগম্বরী। রূপে-গুনে, গৃহকর্মে, শিল্পকর্মে সর্বদিক দিয়ে তিনি ছিলেন সর্বগুণে গুণান্বিতা। শাশুড়ি অলকাসুন্দরী দেবী পর্যন্ত তাঁকে সমীহ করে চলতেন তাঁর দৃঢ় ব্যক্তিত্বের জন্য। আর এরকম দৃঢ় ব্যক্তিত্বময়ী পূর্বসূরীর প্রভাব তাঁর উত্তরসূরীদের জীবনে থাকবে একথা বলাই বাহুল্য।

দিগম্বরীর দুই পুত্রবধূ তাই অনিবার্যভাবে লেখাপড়া শিখেছিলেন। তাঁর পুত্রবধূ সারদা ও যোগমায়াকে। মাইনে করে বৈষ্ণবী এসে তাদের 'শিশু বোধক', 'চাণক্য-শ্লোক', 'রামায়ণ', 'মহাভারত' পড়াতেন। আর কলাপাতায় চিঠি মক্স করানো শেখাতেন। সারদা, যোগমায়া ছাড়াও বাড়ির সব মেয়েই লেখাপড়া শিখতেন। কারণ তৎকালীন সমাজ মেয়েদের মধ্যে যে ভীতি ঢুকিয়ে দিয়েছিল - যে বই পড়লে বিধবা হবে, এই ভীতিকে কোনও দিন প্রশ্রয় দেয়নি ঠাকুরবাড়ির অন্তপুরীকারা।

আরও জানা যায়- "সারদা অবসর সময়ে প্রায়ই একটা না একটা বই খুলে বসতেন। সংস্কৃত রামায়ণ-মহাভারত পড়ে শোনাবার জন্য মাঝে মাঝে ডাক পড়তো ছেলেদের। হাতের কাছে অন্য কোনও বই না থাকলে অভিধানখানাই খুলে বসতেন। যোগমায়াও নানা রকম বই পড়তেন। মালিনী আসত বটতলা থেকে ছাপা বইয়ের পসরা নিয়ে। সেখান থেকে বেছে বেছে বই কিনতেন মেয়েরা। 'নরনারী', 'লায়লা-মজনু', 'হাতিমতাই', 'আরব্য-রজনী', 'লাম্বস টেল', 'পাল ও বর্জিনিয়া' - সবই জোগাড় করেছিলেন যোগমায়া। তাঁর সব লেখা কাব্যোপন্যাস 'কামিনীকুমার'ও থাকত মালিনীর পসরায়। আর থাকতো 'মানভঞ্জন', 'প্রভাস-মিলন', 'কোকিল দূত', 'অন্নদামঙ্গল', 'রতিবিলাপ', 'বস্ত্রহরণ', 'গীতগোবিন্দ', 'বাসবদত্তার' মতো কিছু বই। যোগমায়া বেশ ভালোই বাংলা জানতেন। তাই সত্যেন্দ্রনাথ বলতেন যোগমায়া ছেলেবেলায় তাদের শিক্ষায়ত্রী ছিলেন।"[৩]

এরপর মহির্ষিকন্যা সৌদামিনীর কথায় আসা যাক। বাংলাদেশের স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে তার একটি বিশেষ অবদান আছে। কারণ দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে পাঁচ বছর বয়সেই পেশোয়াজ পরিয়ে স্কুলে পাঠাতেন। এই কাজটি তিনি করেছিলেন একটা বিশেষ দৃষ্টান্ত স্থাপনের উদ্দেশ্যে। তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়, অনেক বাঙালি পিতা তাঁর দেখাদেখি মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে শুরু করলেন। সৌদামিনী সুশিক্ষিত হয়ে দু-একটি ব্রাহ্ম সংগীত ও 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থটি লিখেছিলেন।

সৌদামিনীর বোন চতুর্থ মহর্ষিকন্যা স্বর্ণকুমারী বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক লেখিকা। তাঁর সাফল্য ও কৃতিত্ব সবার থেকে বেশি। বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক মহিলা ঔপন্যাসিকও হন তিনি 'দ্বীপ নির্বাণ' উপন্যাসটি লিখে। সবথেকে বড় কৃতিত্বের কথা তিনি 'কাহাকে' উপন্যাসটি অনুবাদ করেন 'এ্যন আনফিনিষ্টসঙ' নামে। এছাড়া 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদনাও করেন দীর্ঘদিন ধরে। তার বৈজ্ঞানিক বিষয়ক প্রবন্ধ 'পৃথিবী' যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করে। ছোটদের জন্য তিনি পাঠ্যপুস্তকও রচনা করেন।

এছাড়া দু:স্থ আশ্রয়হীন মেয়েরা লেখাপড়া শিখে যাতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে এই উদ্দেশ্যে তিনি 'সখিসমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বপ্রথম মহিলা হিসেবে 'জগত্তারিনী' স্বর্ণপদক পান তিনি। এত বিপুলভাবে শিক্ষা-সংস্কৃতিতে উত্তরণ করেছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী।

স্বর্ণকুমারী সাফল্য ও কৃতিত্বের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে আর একজন মহিলা। তিনি ঠাকুর পরিবারের মেজ বউ জ্ঞানদানন্দিনী। ঠাকুরবাড়ি শিক্ষা দীক্ষা আধুনিক চিন্তা চেতনা যার সাহায্যে প্রবর্তিত হয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কি, জ্ঞানদানন্দিনীই সবার আগে সব রকম বাধা-নিষেধের বেড়া টপকে বৃহত্তম জগতে এসে মেয়েদের মুক্তির পথ খুলে দিয়েছেন। তারপরে আর বিধিনিষেধের পর্দা আব্রু ঘোচাতে মেয়েদের বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। দেবেন্দ্রনাথের মেজ বৌমা অর্থাৎ সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদান্দিনী ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর নারী জাগরণের অন্যতম নেত্রী। ভারতের প্রথম সিভিলিয়ান অফিসারের স্ত্রী তিনি। তাই সত্যেন্দ্রনাথ অন্তঃপুরের বাঁধন ভেঙ্গে স্ত্রীকে অন্তঃপুরের অন্ধকার থেকে নিজের পাশে স্থান দেবেন এটাই স্বাভাবিক। তাই তিনি নিজেই নববিবাহিতা আট বছরে স্ত্রীকে অর্থাৎ তাঁর আদরের 'জ্ঞেনুমনিকে' গড়ে নেওয়ার সাধনে মত্ত হলেন।

তাঁর পড়াশোনা শুরু হলো সেজ দেওর হেমেন্দ্রনাথের কাছে। আস্তে আস্তে 'মেঘনাদবধ' কাব্য পর্যন্ত পড়া এগোলো। অন্যদিকে স্বামী 'জ্ঞেনুমণির' অন্তরের অজ্ঞতা নিরসনের কাজে ব্যস্ত হয়ে রইলেন।

দেবেন্দ্রনাথ বৌমার শিক্ষার জন্য ব্রাহ্মণ সমাজের নবীন আচার্য অযোধ্যানাথ পাকড়াশীকে গৃহ শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করেন। এই প্রথম একজন অনাত্মীয় পুরুষ এসে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে বাড়ির মেয়ে-বৌদের স্কুলপাঠ্য বইগুলি যত্ন করে পড়াতে শুরু করলেন।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তাঁর স্মৃতিকথায় লেখেন –

> "বিয়ের পর আমার সেজো দেবর হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইচ্ছে করে আমাদের পড়াতেন। তাঁর শেখাবার দিকে খুব ঝোঁক ছিল। নিজের সব মেয়েদের ও লেখাপড়া শিখিয়ে ছিলেন। আমরা মাথায় কাপড় দিয়ে তাঁর কাছে বসতুম আর এক একবার ধমক দিলে চমকে উঠতুম। আমি বিয়ের আগেই লিখতে পড়তে পারতুম আর আমার হাতের অক্ষরের খুব প্রশংসা ছিল। আমাদের গুরুঠাকুর বাবামশায়কে বলেছিলে যে বিদ্যা দানের উপর দান নেই। তাই তিনি একটা পাঠশালা খুলে ছিলেন। সেখানে মুসলমান বড়বড় ছেলেরা পর্যন্ত যেত। কেবল আমি একলা ছোট মেয়ে ছিলুম। প্রথমে তালপাতার উপর বড় বড় অক্ষর শেখাতো। তারপর আট ভাঁজের কাগজ তারপর ষোলভাঁজের কাগজে লিখতে পারলে শেষ হত। আমার যা বাংলা বিদ্যা তা হয়েছিল সেজঠাকুরপোর কাছে পড়ে।"[৪]

সত্যেন্দ্রনাথ এসময় সবথেকে দুঃসাহসের কাজটি করে ফেললেন। ঠাকুর পরিবারের সন্তান হয় ঠাকুরবাড়ির বউকে অন্দরমহল থেকে বাইরে নিজের কর্মস্থলে নিয়ে গিয়ে ছিলেন। জ্ঞানদানন্দিনী স্বামীর সাথে স্বামীর কর্মস্থল মুম্বাই গিয়ে ঠাকুরবাড়ির চিরপরিচিত আবহাওয়ার ছন্দপতন ঘটিয়ে দিলেন।

তবে এত সহজে একদিনে এটি সংঘটিত হয়নি। এই প্রগিতিশীলতার দাম তাকে দিতে হয়েছিল। মহর্ষিপত্নীর সাথে তাঁর সম্পর্ক তিক্ত হয় এবং তিনি জ্ঞানদান্দিনীর সাথে কথা বলা বন্ধ করেন।

তবে তাও তিনি স্বামীর সঙ্গে স্বামীর কর্মস্থলে গিয়ে গৃহবিপ্লব ঘটান। এরপর স্বামীর সাথে তিনি বহুস্থানে যান, ইংল্যান্ড অব্দি গিয়েছিলেন। অভিনয়, সংগীত, সাহিত্যচর্চায় জ্ঞানদানন্দিনী সর্বদা স্বামীর উৎসাহ পান। ছোটদের জন্য 'বালক' পত্রিকা প্রকাশ করেন তিনি। 'ভারতী' পত্রিকার সাথেও যুক্ত ছিলেন তিনি।

তাঁর স্মৃতিকথা 'পুরাতনী' বৃদ্ধ বয়সে মুখে মুখে তার সুযোগ্য কন্যা ইন্দিরাদেবীকে বলে। সে অনুলিখনের কাজ করে। এই 'পুরাতনী'তেই জ্ঞানদানন্দিনীকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের পত্রগুলিও পাওয়া যায়।

তবে জ্ঞানদানন্দিনী যে শুধু মেয়েদের পথের কাঁটা ঘুচিয়ে ছিলেন তা নয়। পুরুষের মনের বাধাও অনেকটা দূর করে। যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। যিনি প্রথমে রক্ষণশীল ছিলেন। পরে মেজদা ও মেজ বৌঠানের সাহচার্যে তিনি নব্যপন্থী হয়ে স্ত্রী কাদম্বরীকে ও সে পথে চালনা করে।

ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে যা কিছু দান। তার সাথে ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়ে কাদম্বরী অবদান। অথচ বাজার সরকারের মেয়ে বলে খানিকটা হলেও অবজ্ঞা তার প্রাপ্য হয়েছিল। তাই কোনও কিছুতেই তিনি অংশ গ্রহণ করতেন না। শুধু অপরের প্রেরণার প্রদীপকে উজ্জীবিত করা ছিল তার জীবনের ব্রত। কারণ রোমান্টিক সৌন্দর্যবোধ কাদম্বরীর চিরকালই ছিল। শুধু ঠাকুরবাড়িতে এসে অনুকূল পরিবেশে পেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল তার গভীর চেতনার মানসলোক। তাই কিশোর রবীন্দ্রনাথের মনোগঠনে কাদম্বরীর অবদান অসামান্য। তাই তার অকাল মৃত্যুর ছাপ রবীন্দ্রমানসে আজীবন গভীর প্রভাব রেখে দিয়ে গেছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে খানিটা রক্ষণশীলতার পরিচয় দিলেও সত্যেন্দ্র-জ্ঞান্দানদান্দিনীর প্রভাবে নব্য ভাবের নেশায় মেতে উঠলেন। সত্যেন্দ্রনাথ যেমন জ্ঞানদানন্দিনীকে নিয়ে সব ছেড়ে প্রথম বাইরে পা রেখেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও ঠিক তেমনি সাবেকি সংস্কার ত্যাগ করে কাদম্বরীকে ঘোড়ায় চড়া শিখিয়েছিলেন। গঙ্গার ধারে নির্জনে শিক্ষা পর্ব শেষ হলে কাদম্বরী প্রতিদিনের স্বামীর সঙ্গে গড়ের মাঠে হওয়া খেতে যেতেন। কাদম্বরী অশ্বারোহনে তৎকালীন সমাজে বেশ আলোড়ন তুলেছিল।

কাদম্বরী শুধু অশ্বারোহিনী হয়ে আলোড়ন তুলেছিল তা নয়। এছাড়াও সাধারণ নারীদের চোখে এঁকে দিয়েছিলেন দুঃসহ স্পর্ধায় মায়াঞ্জন। অসাধারণ সাহিত্য প্রেমিকা ছিলেন তিনি। মাত্র দু বছরের ছোট ঠাকুরপো রবির সাথেই তার সাহিত্য আড্ডা খোরাক পেত। তাই 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথকে বলতে শুনি–

> "সাহিত্যে বউঠাকুরানীর প্রবল অনুরাগ ছিল। বাংলা বই তিনি যে পড়তেন কেবল সময় কাটানোর জন্য তাহা নহে - তাহা যথার্থই তিনি সমস্ত মন দিয়া উপভোগ করিতেন। তাহার সাহিত্য চর্চায় আমি অংশী ছিলাম।"[৫]

এছাড়া গৃহসজ্জার দিকেও ছিল তার বিশেষ দৃষ্টি। ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলের প্রতিটি কোনকে সুন্দর করে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি। ছাদে তিনি গড়ে তুলেছিলেন ফুলের বাগান। যার নাম রাখে 'নন্দনকানন'। সেই নন্দনকাননে সন্ধ্যাবেলা বসত গান ও সাহিত্য পাঠের আসর। আসরে যোগ দিতেন অনেকে। বাইরে থেকে আসতেন অক্ষয় চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী শরৎকুমারী, জানকীনাথ ও মাঝে মাঝে আসতেন, আর আসতেন কাদম্বরীর প্রিয় কবি বিহারীলাল।

মাদুরের উপর তাকিয়া দিয়ে রুপোর রেকাবে ভিজে রুমালের উপর দিত বেল ফুলের গোড়ের মালা। এক গ্লাস বরফ জল, বাটা ভর্তি ছাঁচি পান দিয়ে সাজিয়ে রাখতেন নিজের হাতে কাদম্বরী। আসর আরম্ভ হওয়ার আগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সে আসরে বেহালা বাজাতেন আর রবীন্দ্রনাথ ধরতেন চড়া সুরে গান। স্বর্ণকুমারীও এসে এই আসরে তাদের সঙ্গে যোগ দিতেন। কিশোর রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক সৌন্দর্য চেতনাকে জাগাবার জন্য এই পরিবেশ, এই সৌন্দর্য দৃষ্টি ও কল্পনার একান্ত প্রয়োজন ছিল।

রবীন্দ্রনাথের মানসপটে কাদম্বরী বুনে দিয়েছিলেন সেই সৌন্দর্যবোধের বীজ। কাদম্বরীর নান্দনিক রুচিশীলতায় সমৃদ্ধ হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রমানস গঠনে তাই এই অসামান্য নারীর অবদান চিরস্মরণীয়। এমনকি তার কবি হয়ে ওঠার পেছনেও আছে তার নতুন বৌঠানেরই প্রেরণা। এছাড়া তিনি ছিলেন সুঅভিনেত্রী ও সুগায়িকা। কবির জীবনে তার অবদান কবি কোনদিনও ভোলেননি। তাই চিত্রা দেব 'ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল' গ্রন্থে বলেন-

> "প্রতিভার প্রদীপে তেল-সলতে যোগানো সারা। আলো জ্বালার কাজ শেষ। কবির কথায় তাই বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে কাদম্বরীর কথা-
>
> নয়ন সম্মুখে তুমি নাই
> নয়নের মাঝখানে নিয়েছো যে ঠাঁই।"[৬]

এরপর আমরা আসবো কবির 'ছুটি'র কথায়। অর্থাৎ রবীন্দ্র-পত্নী ভবতারিণী। ঠাকুরবাড়িতে প্রবেশ করে নয় বছরের মৃণালিনীতে পরিণত হলো ভবতারিণী। মহর্ষির নির্দেশে ঠাকুরবাড়ি আদব-কায়দা বাচনভঙ্গির

ঘরোয়া তালিম নিলেন মহর্ষি পুত্রবধূ নৃপময়ীর কাছে। নৃপময়ী মেয়েদের সাথে তাকেও নিয়ে যেতেন লরেটো হাউসে। তারপর চলল তার ইংরেজি শেখা, পিয়ানো বাজানো, ঠাকুরবাড়ি আদব-কায়দা, বাচন ভঙ্গি শেখা, এভাবে ফুলতলির ভবতারিণী পরিণত হলেন আধুনিকা মৃণালিনীতে। কিন্তু প্রথমদিন তিনি আদৌও তা ছিলেন না, সে আমরা জানতে পারি মহর্ষি পৌত্র দীপেন্দ্র পত্নী হেমলতা দেবীর লেখনী থেকে –

"বিয়ের সময় কাকীমা ছিলেন খুব রোগা। গ্রামের বালিকা, শহুরে হাবভাব কিছুই জানতেন না। কী মানুষের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হচ্ছে - সে যে কত বড় আশ্চর্য মানুষ, কাকে তিনি পেলেন এর কোন ধারনাই তাঁর ছিল না। কনে এনে সাত পাক ঘুরানো হল - শেষে বরকনে দালানে চললেন সম্প্রদান স্থলে।"[৭]

তবে তখন না বুঝলেও ক্রমে বুঝতে পারে তার কত উদার মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। তিনি নিজেও ক্রমে কবির যোগ্য সহধর্মিনী হয়ে উঠেছিলেন। তাই শান্তিনিকেতন আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপনে নিজের গায়ের গয়না খুলে দিয়েছিলেন স্বামীর মহৎ আদর্শকে কাজে পরিণত করার জন্য। আশ্রমে ছাত্রদের জন্য মাতৃময়ী মৃণালিনী নিজের হাতে রান্না করতেন।

লেখাপড়া শেখা শেষ করে সুশিক্ষিত মৃণালিনী কবির নির্দেশে রামায়ণের সহজ ও সংক্ষিপ্ত অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি মহাভারতের কিছু শ্লোক, মনুসংহিতা, উপনিষদে শ্লোকের অনুবাদ করেন। এছাড়া কবির নির্দেশে তিনি বাংলাদেশের রূপকথা সংগ্রহের কাজে হাত দেয়। অবনীন্দ্রনাথ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে জানায় তার থেকেই পেয়েছিলের 'ক্ষীরেরপুতুল' গল্পটি।

এরপরে আসা যাক পরবর্তী প্রজন্মের কথায়। এই প্রজন্মে যে পূর্বসূরীদের থেকে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে থাকবে একথা বলাই বাহুল্য। সত্যেন্দ্র-জ্ঞানদার কন্যা ইন্দিরা দেবী। যার উপস্থিতি চারিদিকে যেন আলোকিত করে তুলতো। সৌভাগ্য বশত দীর্ঘ জীবনে অধিকারিনী হওয়ায় ঠাকুরবাড়ি অন্দরমহলে আর একটি রত্নকে আমরা পেয়েছিলাম। ছোটবেলা থেকে তিনি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'ছিন্নপত্রাবলী'র প্রাপক। অন্য কোনও ক্ষেত্রে যদি তার কিছুমাত্র দান নাও থাকতো তাহলেও ক্ষতি ছিল না। কারণ রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে যিনি এই অসাধারণ চিঠিগুলি লিখিয়ে নিতে পেরেছিলেন তার সামান্যতা সম্পর্কে কোনও সন্দেহ জাগতেই পারে না। ইন্দিরার পরিচয় এখানে শেষ নয় বরং শুরু।

১৮৭৩ সালে তার জন্ম। ১৮৮৭ সালে এন্ট্রান্স এবং ১৮৯২ সালে বি.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইংরেজি পত্রে সর্বাধিক নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে 'পদ্মাবতী' স্বর্ণপাদক লাভ করেন।

রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত স্নেহের ছিলেন ইন্দিরা। রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে আত্মস্মৃতি মূলক রচনা - সংগীত স্মৃতি, নাটক স্মৃতি, সাহিত্য স্মৃতি, পারিবারিক স্মৃতি প্রভৃতি - ছয়টি অধ্যায়ে এই স্মৃতিকথা গ্রন্থিত। এছাড়া রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে ছিল তার বিশেষ অবদান। তার ব্যক্তিতে ছিল কমল হীরের দীপ্তি । যার ছাপ সাজসাজ্জা বাক্য বিন্যাস ঘর সাজানো থেকে শুরু করে শান্তিনিকেতনে আশ্রম কুটির সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল।

এছাড়া খুব ভালো ফরাসি জানত। ভাগ্যক্রমে তার স্বামী প্রমথ চৌধুরীও ছিলেন ফরাসি ভাষায় সুপন্ডিত। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য শিক্ষায় আদর্শ জীবন গড়ে তুলেছিলেন ইন্দিরা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে দিয়েছিল 'দেশিকোত্তম' উপাধি। রবীন্দ্রভারতী সমিতি থেকে তাঁকে প্রথম 'রবীন্দ্র পুরস্কার' দেয়া হয়। বিশ্বভারতী থেকে উপাচার্যের পদ তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছিল। তাঁর আত্মজীবনী 'শ্রুতি ও স্মৃতি' পান্ডুলিপি আকারে বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে।

এবার আসা যাক এ প্রজন্মে আরেক অন্যতম ব্যক্তিত্বময়ী নারী প্রতিমা ঠাকুরের কথায়। যে রবীন্দ্র পুত্র রথীন্দ্রনাথের স্ত্রী। ঠাকুরবাড়ির বিধবা প্রতিমার সাথে নিজের পুত্র রথীন্দ্রনাথের বিয়ে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ নানা সামাজিক বাধাকে উপেক্ষা করে। তারপর দীর্ঘ বত্রিশ বছর রবীন্দ্র সান্নিধ্যে থেকে তাঁর সেবা করেন প্রতিমা।

শিল্প ক্ষেত্রে তাঁর অনেক অবদান ছিল। তাঁর যা কিছু শিক্ষা রবীন্দ্রনাথের কাছেই। সেই শিক্ষা তার প্রতিভার স্পর্শে নতুন হয়ে উঠেছিল। কবির মত গভীরভাবে প্রতিমাকে তার স্বামীও বুঝতেন না। তাই কবির শেষ জীবনের অনুপুঙ্খ ঘটনার পুনর্নির্মাণ প্রতিমার হাতে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

শান্তিনিকেতনে গিয়ে নানা কাজে জড়িয়ে পড়ে প্রতিমা। নানা রকমের কারুশিল্প প্রবর্তনে রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য পরিকল্পনায় সহযোগিতা করেন, যা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। কারণ সে সময় বাঙালি মেয়েদের মধ্যে নাচ শেখাবার খুব একটা ব্যবস্থা ছিল না। তিনি নিজে কখনও নাচ শেখেননি বা নৃত্য শিল্পীও ছিলেন না। তবুও তিনি নিজের সহজাত প্রতিভা দ্বারা নৃত্য শিখনে উৎসাহ দেন শান্তিনিকেতনের মেয়েদের।

সংস্কৃতি প্রেমি প্রতিমা সাহিত্যের প্রতিও অনুরক্ত ছিল। তাই কবির ঠিক করে দেওয়া 'কল্পিতা দেবী' ছদ্মনামে প্রবাসী পত্রিকায় অনেক কবিতা লেখেন তিনি।

এভাবে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা শিল্প-সংস্কৃতি, সাহিত্য শিক্ষায় নিজেদের স্থান উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতম করে তুলেছিলেন। এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে হয়তো আরও অনেক নামই অগোচরে রয়ে গেল। কিন্তু তাদের সকলের মিলিত প্রয়াসেই তাদের শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্য চর্চার ভাণ্ডারটি পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কারণ তারা প্রত্যেকেই নিজের নিজের গুণে ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে ঠাকুরবাড়ির সুখ্যাতির প্রদীপকে আরও উজ্জ্বল করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তথ্যসূত্র:

১. বিশ্বাস, কৃষ্ণকলি, 'উনিশ শতকের বামা লেখনী', কলকাতা, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০২, পৃ- ৫০
২. দেব, চিত্রা, 'ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল', কলকাতা, আনন্দ, ডিসেম্বর, ২০১৬, পৃ-৬
৩. তদেব, পৃ- ১৪
৪. দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী, 'পুরাতনী', কলকাতা, আনন্দ, এপ্রিল, ২০১৭, পৃ-২৩
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্যের সঙ্গী', 'জীবনস্মৃতি', কলকাতা, বিশ্বভারতী, শ্রাবণ, ১৪১৮, পৃ- ৭২
৬. দেব, চিত্রা, 'ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল', কলকাতা, আনন্দ, ডিসেম্বর, ২০১৬, পৃ-৭৪
৭. গঙ্গোপাধ্যায়, পার্থজিৎ, 'স্মৃতিকথায় জোড়াসাঁকো', কলকাতা, পত্রলেখা, মার্চ, ২০১৯, পৃ-৭৯